।। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ।।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ১৯শে জুলাই জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা কার্তিকেয় রায় ছিলেন কৃষ্ণনগর মহারাজের দেওয়ান এবং তৎকালীন সভাসদদের মধ্যে বিশেষ একজন। কিন্তু কার্তিকেয় রায় সম্বন্ধে শুধু এইটুকু বললেই তাঁকে সম্পূর্ণ চেনা বা জানা যায় না। তিনি ছিলেন অত্যন্ত উদার, রসিক, স্পষ্টবক্তা, মানসম্মানী এবং অতিথিবৎসল। সাহিত্য, সঙ্গীত এবং সামাজিক শিল্পকলার প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল অপরিসীম। তৎকালীন বাঙালী বিদগ্ধজনের মধ্যে কেউই তাঁর সান্নিধ্যে না এসে পারেন নি। তাঁর এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই তাঁকে সর্বজনশ্রদ্ধেয় করে তুলেছিল। কার্তিকেয়র এ সকল সদ্গুণ তাঁর পুত্রদের বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। শৈশবেই তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিভার স্ফুরণ ঘটে। ছোটবেলা থেকেই গান, আবৃত্তি এবং কবিতা লেখার প্রতি তাঁর অনুরাগের পরিচয় মেলে। প্রায় ১২ বছর বয়সে তাঁর কবিতা লেখার হাতে খড়ি হয়। ছোট বয়সেই দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর বাড়িতে উপস্থিত বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র, সঞ্জীবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বিদগ্ধজনের সামনে আবৃত্তি করে বিশেষ প্রশংসা অর্জন করেন।

অল্প বয়সেই (২১-২২ বছরে) M. A. পাশ করে ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে সরকারী কৃষিবিদ্যা শিক্ষালাভের জন্য বিলেত যান। প্রবাসে থাকাকালীন সঙ্গীত তথা সাহিত্যচর্চায় তাঁর এতটুকু ভাটা পড়ে নি। পাশ্চাত্য সঙ্গীত এবং অভিনয়কলার প্রতি তিনি বিশেষ

আসক্ত হন এবং বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় সুন্দর গান রচনা করেন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ফিরে সমাজসেবক তিনি কাজে দিয়ে আসেন। সেই সময় থেকেই তাঁর কার্যকলাপের সূত্র। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের মেয়ে সুরবালার পাণিগ্রহণ করেন।

কালের আবর্তে এমন কিছু লোক আমাদের চলমান জীবনে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকেন, সৃষ্টির মধ্য দিয়ে যাঁরা অতুলনীয় প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। কবি, গায়ক, নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল সেই মানুষদেরই একজন। হাস্যরসিক, দেশপ্রেমিক দ্বিজেন্দ্রলাল তৎকালীন সমাজ শিক্ষার শিক্ষিত বাঙালী বাবুদের ইংরেজী ফ্যাশন অনুকরণ দ্বিজেন্দ্রলাল তৎকালীন সমাজ ... কটাক্ষ করে যে সমস্ত ব্যঙ্গাত্মক হাসির গান রচনা ... এবং সামাজিক রুচি-বিকৃতিকে লক্ষ্য করে যে সমস্ত ... সৃষ্টি করে গেছেন তা অতুলনীয়। তিনি পৌরাণিক, ঐতিহাসিক নাটকের ... দেশাত্মবোধক গানের মধ্য দিয়ে পরাধীন ভারতবাসীর মনে ... জাগিয়ে তুলেছিলেন। এই সব নাটকের দ্বিজেন্দ্রলাল ... দর্শন ফুটিয়ে তোলা এক প্রকার অসম্ভব।

বিধির নিষ্ঠুর পরিহাস এই যে, তাঁর বিবাহিত জীবনের সুমধুর দিনগুলি ... প্রসারিত হওয়ার আগেই তাঁর সুযোগ্যা সহধর্মিণী ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে ... পরলোক গমন করেন। ফলে তিনি ... এবং ... জীবনের বাকী দিনগুলি অত্যন্ত একাকীত্বের মধ্যে কাটান।

কবির সৃষ্ট গ্রন্থগুলির মধ্যে "আর্যগাথা"–১ম খণ্ড (১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ), 'আর্যগাথা'–২য় খণ্ড (১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দ), 'দা লিরিক্স অব ইণ্ড' (১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দ), 'আষাঢ়ে' (১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দ), 'হাসির গান' (১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ), 'মন্দ্র' (১৯০২ খ্রীষ্টাব্দ), 'আলেখ্য' (১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দ), 'ত্রিবেণী' (১৯১২ খ্রীষ্টাব্দ) ইত্যাদি গ্রন্থ এবং 'শাজাহান', 'চন্দ্রগুপ্ত', 'নূরজাহান', 'মেবারপতন', 'দুর্গাদাস', 'সীতা' প্রভৃতি নাট্যগ্রন্থ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অবশেষে নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর জীবনমঞ্চের নাট্য সমাধা করে ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই মে ইহলোক পরিত্যাগ করে প্রার্থিত দুনিয়ার অন্বেষণে পাড়ি দেন।

।। রজনীকান্ত সেন ।।

(আসা যাওয়ার পথের ধারে কান্না হাসির দোল-দোলান পৌষ ফাগুনের মেলা ধরে মহাকালের বুক চিরে কাল-কে যাঁরা সীমার গণ্ডিতে ধরে রাখতে সাধনা করে গেছেন, মরণ সাগর পারে তাঁরা অমর। সেই কীর্তিমান প্রাতঃস্মরণীয়দের জীবন জিজ্ঞাসা আমাদের চলমান জীবনে পারানির কড়ি স্বরূপ পাথেয় করে পাঠশালার দুদিন দিয়ে ঘেরা ঘরে আমি ছিলাম, আছি ও থাকব—এই পরম সত্য ও চিরন্তন সত্তার হাত ধরে প্রতিনিয়ত চক্রাকারে স্রোতে ভেসে চলেছি।

যে মানুষটি মৃত্যুশয্যায় শুয়ে প্রচণ্ড শারীরিক যন্ত্রণাকে অগ্রাহ্য করে মৃত্যু দিন পর্যন্ত সঙ্গীতগত প্রাণ ছিল, যাঁর মধ্যে মানবাত্মার এক জ্যোতির্ময় প্রকাশ দেখে ছিলেন কবিগুরু

রবীন্দ্রনাথ ; তিনি রোগশয্যার পাশে বসে নিদারুণ কষ্ট হাসিমুখে সহ্য করতে দেখে পরে পত্রে সেই মানুষটিকে লিখেছিলেন...

"শরীর হার মানিয়াছে কিন্তু চিত্তকে পরাভূত করিতে পারে নাই, কণ্ঠ বিদীর্ণ হইয়াছে, কিন্তু সঙ্গীতকে নিবৃত্ত করিতে পারে নাই।"

এই প্রাতঃস্মরণীয় মহামানবটি ১৮৬৫ সালের ২৬শে জুলাই পাবনা জেলার ভাঙ্গা বাড়ী গ্রামে বিশেষ সরকারী পদে অধিষ্ঠিত এবং সঙ্গীতগুণী গুরুপ্রসাদ সেন মহাশয়ের ঘরে আবির্ভূত হন এবং জীবনাঙ্গনের খেলা শেষ করে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে ৪৫ বৎসর বয়সে লীলাধাম পরিত্যাগ করেন। সেই মানুষটি অর্থাৎ কবি রজনীকান্ত সেন তাঁর স্বল্প পরিসর জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত নিমগ্ন ছিলেন সঙ্গীত তথা সঙ্গীত সৃষ্টিতে।

কথা ও সুরের সহজ সারল্যে মাধুর্য্যে কান্তকবি রজনীকান্তের গান বাংলার এক অমূল্য সম্পদ। তিনি নিজের গানে নিজেই সুর দিতেন। যদিও সঙ্গীতে রজনীকান্তের কোন আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ছিল না, তাঁর ছিল অসাধারণ সঙ্গীত প্রতিভা যা ভগবদত্ত। ছোট থেকেই তাঁর সঙ্গীতে আগ্রহ, গান শুনতে ভালবাসতেন এবং শুনে গান আয়ত্ত করতে চেষ্টা করতেন।

রজনীকান্তের পিতা গুরুপ্রসাদ সেন প্রথমে ঢাকার মুন্সেফ এবং পরে বরিশালের সাবজজ হন। তিনি কবি ছিলেন, ব্রজবুলি ভাষায় বৈষ্ণব পদাবলী ও শিবদুর্গা পদাবলী রচনা করে তাতে সুর সংযোজন করেছিলেন। রজনীকান্ত তাঁর পিতার গুণের যোগ্য উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন, তিনি খুব ছোট বয়স থেকে গান বাঁধতে আরম্ভ করেছিলেন। পনের বছর বয়সে লেখা তাঁর দুটি গান "নবমী দুঃখের নিশি দুঃখ দিতে আইল" ও "মায়ের চরণ যুগল প্রফুল্ল কমল মহেশ স্ফটিক হলে।"

চোদ্দ বছর বয়সে রজনীকান্ত এক সহচর লাভ করেছিলেন, তাঁর নাম তারকেশ্বর চক্রবর্ত্তী, এক অর্থে এই তারকেশ্বর চক্রবর্ত্তীই ছিলেন তাঁর সঙ্গীত গুরু, যদিও নিয়ম মেনে সঙ্গীতাভ্যাস রজনীকান্ত করেননি। আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে রজনীকান্ত রাজসাহীতে ওকালতি ব্যবসা সুরু করেন। কিন্তু ওকালতিতে সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করতে পারেন নি। তাঁর নিজের লেখাতেই পাওয়া যায়, "আমি আইন ব্যবসায়ী কিন্তু ব্যবসা করিতে পারি নাই...আমি শিশুকাল হইতে সাহিত্য ভালবাসিতাম...আমার চিত্ত তাই লইয়াই জীবিত ছিল।"

কিশোর বয়সেই গান ছাড়াও কবিতা এবং নাট্যকলার প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হন ও বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যানুরাগ আরও দৃঢ় হয়। তিনি নিজেও খুব ভালো গান গাইতেন এবং যে কোন সভা বা মজলিশ বা অনুষ্ঠানে স্বরচিত গান গেয়ে আসর মাত্ করতেন। আর তাই মাননীয় প্রমথনাথ বিশী মহাশয় রজনীকান্তকে উৎসবরাজ আখ্যায় ভূষিত করেছেন। ১৯০২ সালে তাঁর প্রথম বই "বাণী" প্রকাশিত হয়। ১৯০৪ সালে কবির দ্বিতীয় গ্রন্থ "কল্যাণী" প্রকাশিত হয়। "কল্যাণী"তে কবি রাগ রাগিণী ও তালের উল্লেখ করেছেন। "বাণীর" প্রথম সংস্করণে রাগ ও তালের উল্লেখ ছিল না। তবে দ্বিতীয় সংস্করণে এগুলির উল্লেখ ও কিছু নতুন গান সংযোজন করা হয়। রজনীকান্তের সাহিত

মৃত্যুর পূর্বে তিনটি ও পরে তিনটি পুস্তক প্রকাশিত হয়। সৃষ্টির পরিমাণ খুব বেশী নয়। [illegible] ছিলেন যোগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এবং সমসাময়িক কবি রজনীকান্তের গানের বাহক ও ধারক ছিলেন রজনীকান্তের ভাই, যিনি সাধক গায়ক। উদার গায়ক। যোগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ছিলেন রজনীকান্তের সহপাঠী। তিনি হতেন হিন্দু সঙ্গীতের প্রতি অনুরক্ত এবং অত্যন্ত প্রিয় রজনীকান্তের সহপাঠী ছিলেন। রজনীকান্ত তাঁর স্বল্প জীবনে ২৯০টি গান রচনা করেছেন। ভক্তির সাথে সুরের সমন্বয় রজনীকান্ত তাঁর গানে এক অপূর্ব মহিমায় আসীন করেছেন। রজনীকান্তের গানগুলিকে রজনীকান্তের গানকে এক [illegible] ভাগ করা যায়। যথা—ভক্তিমূলক বা আধ্যাত্মিক গান, মূলতঃ এই কয় ভাগে ভাগ করা যায়। প্রেম ও জীবনের গান, বিভিন্ন রস হিসাবে, দেশাত্মবোধক গান, হাস্যরসাত্মক গান এবং প্রেম ও জীবনের গান। রজনীকান্তের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। এ জাতীয় গানে তিনি যায় যে ভক্তিমূলক গানগুলিই রজনীকান্তের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি এবং অন্যান্য সর্বজনীন সঙ্গীত প্রতিভার চরম নিদর্শন। বৈষ্ণব ও শাক্ত পদকর্তাগণ বাউল এবং অন্যান্য প্রমুখ কবি ও সঙ্গীত স্রষ্টা তথা রামমোহন, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ, নজরুল প্রমুখ কবি ও সঙ্গীত স্রষ্টা বাংলার ভক্তিগীতের ধারাটিকে পুষ্ট করেছেন। রজনীকান্তের কালেও বিভিন্ন সময়ে বাংলার ভক্তিগীতের ধারাটিকে পুষ্ট করেছেন। রজনীকান্তের ভক্তিগীতিগুলিও এই ধারারই অন্তর্গত, তাঁর মধ্যে যে ঐকান্তিক ঈশ্বর নির্ভরতা ছিল তা তাঁর ভক্তিগীতির মধ্য দিয়ে মূর্ত হয়ে উঠেছে। তাঁর "বাণী" এবং "কল্যাণী" পুস্তক ভক্তিগীতের সংকলন। দেশাত্মবোধক ও হাসির গান উক্ত পুস্তক দুটির মধ্যে স্থান পেয়েছে ভক্তিসঙ্গীতগুলির ফাঁকে ফাঁকে। তাঁর ভক্তি ভাবাত্মক গানের কয় দৃষ্টান্ত কয়েকটি দেওয়া হল : "তুমি নির্মল কর মঙ্গল করে মলিন মর্ম মুছায়ে", "আমি তো তোমারে চাহিনি জীবনে", "পাতকী বলিয়ে কি গো পায়ে ঠেলা ভাল হয়" ইত্যাদি। কবির জীবনে চলতি পথে মাঝে মাঝেই আত্মীয় বিয়োগজনিত শোকের ছায়াপাত ঘটেছে। কিন্তু ঈশ্বর বিশ্বাসের জোরে তিনি এমন শোক সহ্য করেছেন এবং রচনা করেছেন অপূর্ব সব সঙ্গীত। তাঁর তৃতীয় পুত্রের মৃত্যুতে নিদারুণ শোক পেয়েছিলেন, তার "তোমারি দেওয়া প্রাণে, তোমারি দেওয়া দুখ, তোমারি দেওয়া বুকে, তোমারি অনুভব", গানটি রচনা করে এবং গেয়ে সান্ত্বনা লাভ করেছিলেন। রোগ-শয্যায় রবীন্দ্রনাথ তাঁকে একবার দেখতে গিয়েছিলেন, তাঁর চলে যাবার পর কবিগুরুর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে ও কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ রজনীকান্ত একটি গান রচনা করে পাঠিয়েছিলেন "আমায়, সকল রকমে কাঙাল করেছে গর্ব করিতে চুর, যশ ও অর্থ, মান ও স্বাস্থ্য সকলি করেছে দূর।"

তাঁর লেখার প্রতিটি ছত্রে যেন ঈশ্বরের প্রতি সর্বসমর্পণের আকুতি ঝরে পড়েছে। তাই প্রমথনাথ বিশী মহাশয় বলেছেন : "কান্ত কবির ভক্তিসঙ্গীতগুলি বাংলা ভক্তি সাধনার জাহ্নবীতে যে একটি ক্ষীণধারা উপনদীরূপে যুক্ত হইয়া আমাদের মানসিক সম্পদকে চিরদিনের জন্য বাড়াইয়া দিয়াছে তাহা অবিনশ্বর।"

রজনীকান্তের লেখা দেশাত্মবোধক গানগুলি, তৎকালীন দিনে সর্বসাধারণের মনে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, বিশেষ করে তাঁর লেখা ও গাওয়া "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই ; দীন দুখিনী মা যে তোদের তার বেশি আর সাধ্য নাই", গানটি প্রচণ্ড জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং লোকের মুখে মুখে ফেরে। তাঁর কয়েকটি

দেশাত্মবোধক সঙ্গীতের মধ্যে "জাগ সুমঙ্গলময়ী মা। মুঞ্জরি তরু পিক গাহি ; করুক প্রচারিত মহিমা!" "জয় জয় জনমভূমি, জননী" "তব চরণ নিম্নে, উৎসবময়ী শ্যাম ধরণী সরসা", "নমো নমো নমো জননী বঙ্গ" প্রভৃতি।

হাস্যরসাত্মক গান রজনীকান্তের সঙ্গীতের আর একটি দিক। তিনি সাধারণতঃ হাসির গানগুলি হাসির সঙ্গে করুণ তথা শান্ত রসমিশ্রিত করে রচনা করতেন, যার জন্য দ্বিজেন্দ্রলালের অনুসারী হয়েও দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানের সঙ্গে তাঁর গানের প্রভেদ ছিল। প্রমথনাথ বিশী মহাশয় কান্তকবির হাস্যরসাত্মক গানের যে মন্তব্য করেছেন তা প্রণিধানযোগ্য, "দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান যদি শুষ্ক শীতের বাতাস হয় তবে রজনীকান্তর হাসির গান বর্ষার জলভারাক্রান্ত পূবের বাতাস।"

রজনীকান্ত নিজের হাস্যরস সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন যে "হাস্যরসের মধ্যে অন্তঃসলিলা ফল্গুর ন্যায় অসামান্য গভীর ভাবের স্রোত প্রবাহিত হয়, তাহাই উৎকৃষ্ট হাস্যরস। হাস্যরস যদি প্রচ্ছন্ন ভাবে উপদেশ মূলক হয়, তাহা হইলে হাস্যরস ইহজগতে কখনই সম্পূর্ণ অনাবশ্যক নয়।" তাঁর হাসির গান তিন ভাগে ভাগ করা যায়, যথা—উপদেশ মিশ্রিত হাসির গান, সমাজ সম্পর্কীয় হাসির গান ও বিশুদ্ধ উপভোগের জন্য হাসির গান। তাঁর একটি উপদেশমূলক হাসির গান, সাধনার ধন। ব্যাঙ্গাত্মক গান— "সে কি তোমার মত, আমার মত, রামার মত, শ্যামার মত, ডালা কুলো ধামার মত,— যে পথে ঘাটে দেখতে পাবে?" তাঁর আরও কয়েকটি হাসির গান—

"সে, কি রে মন, মুড়কী মুড়ী, মণ্ডা জিলাপী কচুরি?
যে তাম্রখণ্ডে খরিদ হয়ে উদরস্ত হয়ে যাবে?"

"আমরা ব্রাহ্মণ বলে নোয়াব না মাথা কে আছে এমন হিন্দু?" এবং ডাক্তার শীর্ষক গানে একস্থানে বলেছেন Medical certificate-এর জন্য, এলে ধনী কেহ, ঐ, জলপানি কিঞ্চিৎ হাতিয়ে, বলে দেই, 'অতি রুগ্ন দেহ' ইত্যাদি।

আধুনিক সাহিত্যে প্রেম একটি প্রধান স্থান দখল করলেও রজনীকান্তের প্রেমের গান বিশেষ দেখা যায় না। তবে একেবারে বিরল নয়, যথা—"মধুর সে মুখখানি কখনও কি ভোলা যায়, স্বপনে তাহারে কুড়ায়ে পেয়েছি রেখেছি, স্বপনে ঢাকিয়া।" রজনীকান্তের গানের সুর প্রধানত সহজ সরল, জটিলতা বা সুরের মার প্যাঁচ বিশেষ নেই, অথচ গানগুলি প্রচণ্ড হৃদয়গ্রাহী এবং সহজেই গানের মধ্যে প্রবেশ করা যায়, তাঁর বহু গানই রাগাশ্রিত কিন্তু কখনই তা রাগ প্রকাশের বাহন হয়নি। রাগমিশ্রিত অসংখ্য গানের মধ্যে কয়েকটি বাগেশ্রীতে—"অনন্ত দিগন্ত ব্যাপী অনন্ত মহিমা তব," মালকোষ—"অসীম রহস্যময়। হে অগম্য! হে নির্বেদ!" পরজ-এ "তব বিপুল প্রেমাচল চূড়ে", ভৈরবীতে— "তুমি নির্ম্মল কর, মঙ্গল করে", বেহাগ-এ "আমি অকৃতি বলে ও তো, কিছু", বাঁরোয়াতে—"ওরা চাহিতে জানে না দয়াময়", গৌরীতে—"সেথা আমি কি গাহিব গান," বসন্ত বাহার-এ—"মাগো আমার সকলি ভ্রান্তি", সুরট-মল্লার-এ—"নমো নমো নমো জননী বঙ্গ" ইত্যাদি। এ ছাড়া আরো অনেক রাগে অনেক গান আছে, দেশজ সুরেরও প্রভাব দেখা যায় তাঁর গানে। যেমন ঃ বাউলের সুরে—"কুলু কুলু কুলু নদী বয়ে যায়", "প্রেমে

জল হয়ে যাও গলে", "তুমি আমার অন্তঃস্থলের খবর জান" ইত্যাদি, কীর্ত্তনের সুরে, "নাথ ধর হাত",—মনোহরসাহি ঢঙে—"যেমনটি তুমি দিয়েছিলে মোরে" "ক্ষুদ্র হৃদয় পল্লব জল" ইত্যাদি। রামপ্রসাদী সুরে—"আমায় পাগল করবি কবে" "মা আমি যেমন তোর মন্দ ছেলে", "মা কখন এলে, কখন গেলে" প্রভৃতি। অন্যান্য সুরের অনুসারী তিনি কয়েকটি গান রচনা করেছেন, তবে তিনি তা অকপটে স্বীকার করে গেছেন। তাঁর গানে পাশ্চাত্য সঙ্গীতের প্রভাব প্রায় নেই বললেই চলে, তবে ন্যাশের ছন্দে একটি স্বদেশী গান রচনা করেছেন, "ফুলার কল্লে হুকুমজারী।"

একতাল, তেওড়া, কাওয়ালী, গড়খেমটা, ঝাঁপতাল, আড়খেমটা, যৎ, কাহারবা, প্রভৃতি তাল রজনীকান্ত ব্যবহার করেছেন তাঁর বিভিন্ন গানে।

রজনীকান্তের অনেক গান রেকর্ড হয়েছে, কিন্তু তাঁর বহু আগে তিনি নিজেও একবার তাঁর গান রেকর্ড করেছিলেন। এ ছাড়া অন্যান্য বহুনামী শিল্পী তাঁর গান প্রচার ও প্রসারে একনিষ্ঠ উদ্যোগ নিয়েছিলেন। বিশেষ করে তাঁর দৌহিত্র দিলীপ কুমার রায় কান্তকবির গান প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। এই কালোত্তীর্ণ শিল্পী তাঁর সৃষ্টির মধ্য দিয়ে আমাদের তথা উত্তরসূরী প্রজন্মর মধ্যে যে শ্রদ্ধার আসন পেতে গেছেন তা চিরকাল অম্লান থাকবে।

।। অতুলপ্রসাদ সেন।।

বাংলার সঙ্গীত জগতে অতুলপ্রসাদ একটি স্মরণীয় নাম। যাঁর নাম বাংলার রসিক সঙ্গীত শ্রোতার কাছে উজ্জ্বল হয়ে আছে এবং থাকবে।

তাঁর পিতা রামপ্রসাদ সেন এবং মাতা হেমন্তশশী দেবী, যদিও মূলতঃ ফরিদপুর জেলার মগরগ্রামের অধিবাসী ছিলেন কিন্তু পরবর্ত্তীকালে চিকিৎসক পিতা নিজ কর্ম্মোপলক্ষে ঢাকা সহরে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন এবং চিকিৎসকরূপে বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করেন।

১৮৭১ সনে ২৫শে অক্টোবর মতান্তরে ৩০শে অক্টোবর ঢাকা শহরে অতুলপ্রসাদ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন।

মাত্র তেরো বৎসর বয়সে পিতার মৃত্যু হওয়ায় মাতামহ কালীনারায়ণ গুপ্ত মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে অতুলপ্রসাদের পড়াশুনা চলতে থাকে। মাতুলালয়ে থাকাকালীন তাঁর সঙ্গীতে হাতেখড়ি হয়। ১৮৯০ সনে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কোলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্ত্তি হয়ে কিছুকাল অধ্যয়ন করেন এবং পরে ব্যারিষ্টারী পড়ার জন্যে বিলেতে যান। সেখানে থাকার সময় পাশ্চাত্ত্যের চিত্রকলা, নাটক এবং পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীতের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হন এবং ভারতীয় ও পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীতের আধারে একটি পুস্তক রচনা করেন। পুস্তকটি তৎকালীন বিদেশী গুণীজন দ্বারা বিশেষ আদৃত হয় ও খ্যাতিলাভ করে।

১৮৯৫ সালে ব্যারিষ্টারী পাশ করে অতুলপ্রসাদ স্বদেশে ফিরে আসেন এবং প্রথমে কলিকাতা, রংপুর ও পরে লক্ষ্ণৌ শহরে স্থায়ী ভাবে ব্যবহারজীবির পেশা গ্রহণ করে বসবাস সুরু করেন। এই ক্ষেত্রেও তাঁর কৃতিত্ব ও খ্যাতি অনস্বীকার্য্য। তার ফলশ্রুতি স্বরূপ বার অ্যাসোসিয়েশনে তিনি সভাপতির আসনে অভিষিক্ত হন। খ্যাতি, সম্মান এবং তাঁর প্রতি ভালবাসার নিদর্শন হিসেবে লক্ষ্ণৌর একটি রাস্তার নামকরণ হয় তাঁরই নামে। এটি তাঁর প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসারই সাক্ষ্য বহন করে।

সাহিত্যে অনুরাগ অতুলপ্রসাদের আর একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। তিনি সারা জীবন সমস্ত কাজের মধ্যে থেকেও সাহিত্যের সেবা করে গেছেন। বারাণসী থেকে 'উষা' নামে যে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয় তা তাঁরই একান্ত প্রচেষ্টা ও অধ্যবসায়ের ফলশ্রুতি।

এ ছাড়া তিনি বেশ কয়েকবার "প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন" ও "নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে" সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন যা, তাঁর সাহিত্য প্রীতির পরিচায়ক।

সম্ভবতঃ সঙ্গীততীর্থ লক্ষ্ণৌ শহরে স্থায়ীভাবে বসবাস করবার জন্য এবং কিশোর বয়স থেকে জীবনের নানা কর্ম্মের মধ্যেও সঙ্গীতের প্রতি গভীর মমত্ববোধ হেতু তিনি এক নতুন বাংলা সঙ্গীতের জন্ম দিয়ে গেছেন। সেই সঙ্গীত আজও সর্ব্বজনাদৃত অতুলপ্রসাদী সঙ্গীত নামে পরিচিত। কারও কারও বিশ্বাস তিনিই সর্ব্বপ্রথম বাংলা গানে রাগের অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছেন ও ঠুংরী শৈলীর মনোরম গায়কীকে বাংলা গানে প্রয়োগ করে বিশেষ এক বৈচিত্র্য এনেছেন। যা, আজ একটি নবধারার গতিময়তায় ও রূপে-রসে ভাস্বর। কবির লেখনী ও সুরে প্রেম, প্রকৃতি, স্বদেশ ইত্যাদি এবং ঠুংরী, গজল, টপ্পা, বাউল প্রভৃতি শৈলীর গান বাংলা সঙ্গীতে একটি নবদিগন্তের উন্মেষ ঘটিয়েছে। তাঁর এই সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে আমরা প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্ত্তে কবিকে একান্ত করে পাই।

যদিও তাঁর গানের সংখ্যা সীমিত তবুও একথা বললে বোধহয় অত্যুক্তি হবে না যে, গুণগত বৈশিষ্ট্যে ও প্রকাশের ভঙ্গিমায় তিনি আমাদের মনের গভীরে স্মৃতির মণিকোঠায় চিরঞ্জন হয়ে থাকবেন। প্রেমের করুণ রসে সিক্ত, বিরহীর না-পাওয়া বাঁশরীর সুর তাঁর গানে জীবন্ত রূপ পরিগ্রহ করে শ্রোতার মনকে নাড়া দিয়ে যায়। 'কাকলি', 'গীতিগুঞ্জ' প্রভৃতি কয়েকটি পুস্তকে তাঁর গানগুলি প্রকাশিত হয়েছে।

রবীন্দ্রধন্য অতুলপ্রসাদ ১৯৩৪ সনে ২৬শে আগষ্ট ৬৩ বৎসর বয়সে এই পার্থিব জগতের কর্ম্মযজ্ঞ থেকে বিশ্রাম নিয়ে সুরলোকের অমর যাত্রায় পাড়ি দেন। কিন্তু আজও তাঁর সৃষ্ট সুর আমাদের মনকে ছুঁয়ে যায়।

।। কাজী নজরুল ইসলাম।।

বর্দ্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার জামুরিয়া থানার অন্তর্গত চুরুলিয়া গ্রামে ১৮৯৯ সালের ২৪শে মে (১৩০৬ সনের ১১ই জ্যৈষ্ঠ) মঙ্গলবার এক বিশেষ গরীব পরিবারে কাজী নজরুল ইসলাম জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম কাজী ফকির

আহমদ্ ও মাতার নাম জাহেদা খাতুন। নজরুলের পিতা দুটি বিবাহ করেন, তাঁর সাত পুত্র ও দুই কন্যা ছিল। সহোদর ভাইবোনের মধ্যে নজরুলেরা তিন ভাই ও এক বোন। তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কাজী সাহেবজান, কনিষ্ঠ ভ্রাতা কাজী আলী হোসেন ও বোন উম্মে কুলসুম। চার ভ্রাতার অকাল মৃত্যুর পর নজরুলের জন্ম হওয়ায় তাঁর ডাক নাম হয় দুখু মিঞা।

কাজী বংশ মূলতঃ বিহার প্রদেশের হাজীপুর নিবাসী হলেও সপ্তটি শাহ্ আলমের রাজত্বকালে চুরুলিয়ায় এসে স্থায়ী ভাবে বসবাস সুরু করেন। নজরুলের বাড়ীর নিকটস্থ পীরপুকুরের প্রতিষ্ঠাতা সাধক হাজী পাহলোয়ানের মাজার শরীফ এবং একটি মসজিদের সেবাইৎ হিসাবে তাঁর পিতা ফকির আহমদ ও পিতামহ কাজী আমিনুল্লাহ সংসারের ভরণ পোষণ চালাতেন। নজরুল বাল্যকালে অত্যন্ত চঞ্চল স্বভাবের ও দুরন্ত ছিলেন। কোন শাসন অনুশাসনের ধার ধারতেন না। ফলে গ্রামবাসীরা তাঁর অত্যাচারে বিশেষ ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠে। মাত্র নয় বৎসর বয়সে (১৯০৮ সালে) পিতার অকাল মৃত্যুতে সংসারের সমস্ত দায়-দায়িত্ব তাঁর উপরে এসে পড়ে। ফলে ধারাবাহিক ভাবে তাঁর জীবনে পড়াশুনা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় নি। গ্রামের মক্তবে পড়াশুনা করতেন। পরবর্তীকালে উক্ত মক্তবে শিক্ষকতা করে এবং গ্রামে গ্রামে মোল্লাগিরি করে জীবিকা নির্বাহ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাঁর মেধা ও জ্ঞানপিপাসা স্কুলের বিধিবদ্ধ পড়াশুনার বাহিরে যেখানে যা কিছু শিক্ষণীয় তাঁকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করত। তিনি ছিলেন স্বভাব উদাসীন, তাই তাঁকে লোকে তারাখ্যাপা ও নজর আলি নামে অভিহিত করত। আর্থিক উপার্জনের প্রয়োজনে তিনি লেটো গানে ভাষা ও সুর প্রয়োগ করে বিশেষ সুনাম অর্জ্জন করেন। ফলে নিমসা, চুরুলিয়া এবং রাখাখুড়া এই তিনটি লেটো নাচের দলে নাটক রচনার ভার পান এবং ঐ সময়েই বড় বড় ঐতিহাসিক নাটক ও 'মেঘনাদ বধ' নামে একটি নাটক রচনা করেন। লেটো গানের দলে থাকাকালীন ঢোলক, বাঁশী তথা গান সৃজনে বিশেষ পারদর্শিতার পরিচয় দেন। হঠাৎ স্বভাব উদাসী নজরুল সব কিছু ছেড়ে বর্দ্ধমান জেলার মাথরুণ হাইস্কুলে ভর্ত্তি হন। একদিন একজন বাঙালী ক্রিশ্চান গার্ডসাহেব তাঁর গানে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে বাবুর্চির কাজ দেন। কিছু দিন বাদে মালিকের সাথে হাঙ্গামার ফলে কাজ ছেড়ে দেন এবং আসানসোলে আবদুল ওয়াহেদ্ নামে এক ব্যবসায়ীর রুটির দোকানে মাসিক পাঁচ টাকা বেতনের কাজে যোগ দেন। সারাদিন পরিশ্রম করা সত্ত্বেও সাহিত্যচর্চায় তাঁর এতটুকু ভাটা পড়ে নি। সেই সময় তাঁর গানে আকৃষ্ট হয়ে আসানসোলের দারোগা রফিউদ্দিন আহমেদ্ ত্রিশাল থানার অন্তর্গত ময়মনসিংহ জেলার কাজীর সিমলা গ্রামের দরিরামপুর হাইস্কুলে ফ্রি ছাত্ররূপে তাঁকে ১৯১৪ সালে সপ্তম শ্রেণীতে ভর্ত্তি করে দেন। তারই অব্যবহিত পরে ১৯১৫ সালে রাণীগঞ্জে শিয়াড়শোল রাজস্কুলে অষ্টম শ্রেণীতে ভর্ত্তি হন। তাঁর মেধার পুরস্কার হিসেবে রাজবাড়ী থেকে মাসিক সাত টাকা বৃত্তি ও নিখরচায় পড়াশুনা এবং হোস্টেলে থাকার সুযোগ পান। ঐ সময়ই প্রখ্যাত সাহিত্যিক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে নজরুলের পরিচয় ঘটে এবং ক্রমে সেই পরিচয় গভীর বন্ধুত্বে পরিণত হয়। ১৯১৭ সালে প্রিটেষ্ট

পরীক্ষার সময় সামরিক প্রয়োজনে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন তিনি পল্টনে যোগদান করেন। সেখানে পাঞ্জাবী এক মৌলবী সাহেবের সাথে পরিচয় ঘটে, তিনি ফারসী সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন। উনিই প্রেরণার এবং পুরস্কার কাজী নজরুল কবির ও শিল্পীর প্রতিভা মুকুলিত করে। বাল্যকালে ফারসী ভাষা শিক্ষালাভ করবার হেতু তিনি পল্টনে থাকাকালীন ফারসী সাহিত্যে যথেষ্ট পড়াশুনা করার সুযোগ পান এবং ব্যুৎপত্তি লাভ করেন।

(যুদ্ধশেষে তিনি পল্টন বাহিনীভঙ্গের পর সৈনিক বৃত্তি ছেড়ে কলকাতায় চলে আসেন এবং বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ লিখতে শুরু করেন। এসময়ে 'বিদ্রোহী' ও 'কামালপাশা' কবিতা প্রকাশিত হওয়ার পর তাঁর নাম বাঙালী সমাজে ছড়িয়ে পড়ে। ১৯২০ সালে এ. কে. ফজলুল হকের দৈনিক "নবযুগ" পত্রিকায় নজরুল এবং মুজফ্‌ফর আহমেদ যুগ্ম সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বিদেশী সরকারের বিরুদ্ধে এবং পরাধীন ভারতবাসীকে স্বাধীনতা মন্ত্রে দীক্ষিত করাই ছিল এই পত্রিকাটির মূল উদ্দেশ্য। উক্ত পত্রিকায় সম্পাদকীয় বা প্রবন্ধাদি যুক্ত করে 'যুগবাণী' নামক একটি পুস্তক প্রকাশিত হয়, ফলে তাঁর সমস্ত ব্রিটিশ সরকার পুস্তকটি বাজেয়াপ্ত করে) সাহিত্য এবং সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে পরাধীন দেশের শৃঙ্খল মুক্তিকামী নজরুল চারণ কবির ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। (১৯২২ সালে নজরুল 'ধূমকেতু' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা বার করেন) 'ধূমকেতুর' মধ্যে অগ্নিযুগের বিপ্লবী আন্দোলনের সমর্থনে প্রবন্ধ, কবিতা প্রভৃতি প্রকাশিত হত। ইংরেজ সরকার 'ধূমকেতুর' জন্য তাঁর হাত রাজদ্রোহিতার অপরাধে নজরুলকে একবৎসরকাল সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে। জেলের অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে স্বাধীনতাকামী কবি উনচল্লিশ দিন অনশন করেন। কবিগুরুর প্রার্থনায় এবং কর্তৃপক্ষ সমস্ত দাবী মেনে নেওয়ায় তিনি অনশন ভঙ্গ করেন। জেলে তাঁর অসমসাহসিক কৃতিত্বের বিবরণ তাঁকে বাংলার জনমানসে বিশেষ জনপ্রিয় তথা শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত করে।

১৯২৪ সালের ২৪শে এপ্রিল নজরুল গিরিবালা দেবীর কন্যা প্রমীলাকে বিবাহ করেন। ১৯২৬ সালে নজরুলের বুলবুল নামে একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে কিন্তু দুঃখের বিষয় এই ছেলের দুলাল মাত্র চার বছর বয়সে বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোক গমন করে। শোকে দুঃখে কবি মুহ্যমান হয়ে পড়েন এবং শান্তির আশায় কবি তখন যোগী বরদাচরণের সান্নিধ্যে এসে মানসিক শান্তি লাভ করেন এবং বিশৃঙ্খল জীবনে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন। এই সময় তাঁর "হিন্দু মুসলিম যুদ্ধ", "পথের দিশা", "কাণ্ডারী হুঁশিয়ার" প্রভৃতি কবিতা রচিত হয় এবং এই সময় থেকে নজরুল সঙ্গীত রচনায় বিশেষ মেতে ওঠেন। (১৯২৯ সাল থেকে নজরুল গ্রামোফোন কোম্পানীর সঙ্গে যুক্ত হন এবং ১৯৩৫ সালে নজরুল গ্রামোফোন কোম্পানীর এক্সক্লুসিভ কম্পোজার নিযুক্ত হন। নজরুল গীতি ক্রমে ক্রমে জনপ্রিয়তার তুঙ্গে ওঠে এবং কলকাতা বেতার কেন্দ্র কবিকে সুরসৃষ্টি ও গান রচনার কাজে নিয়োজিত করে। কবিপত্নী প্রমীলা কাজী ১৯৪০ সালে এক দুরারোগ্য পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হন। কিন্তু কবির সকল প্রচেষ্টাই নিষ্ফল

২৩.১১.৭৮

হয়। [illegible] এবং [illegible] [illegible] জীবন যাপন করেন। [illegible] ১৯৭৬ সালের [illegible] তাঁকে [illegible] পুরস্কৃত করা হয়।